কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ৬

সূরা রা'দ ৮-১৮ আয়াত

ٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَحۡمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلۡأَرۡحَامُ وَمَا تَزۡدَادُۖ وَكُلُّ شَيۡءٍ عِندَهُۥ بِمِقۡدَارٍ

৮. প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তার নিকট প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং - এর অর্থ হচ্ছে, মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সুশ্রী কি কুশ্রী, সৎ কি অসৎ তা সবই আল্লাহ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে তাও আল্লাহ তা'আলা জানেন। [আদওয়াউল বায়ান]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আলেমুল গায়েব। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছেঃ (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ)অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যা কিছু গভাশয়ে রয়েছে। [সূরা লোকমানঃ ৩৪] আমরা যদি সূরা লোকমান এর এ আয়াতটির সাথে আলোচ্যসূরার (وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ)আয়াতকে একসাথে মিলিয়ে তাফসীর করি তাহলে বর্তমান কালের এ আয়াত সংক্রান্ত অনেক সন্দেহের জবাব দেয়া সহজ হয়ে যাবে। কারণ সূরা লোকমানের আয়াতে যা বলা হয়েছে এ আয়াত তার তাফসীর হতে পারে।

ফলে গর্ভাশয়ে অবস্থিত সন্তানের অবস্থা বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা গেলেও তা সূরা লোকমান এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি গায়েব এর জ্ঞানের দাবী কেউ করতে পারবে না। বিশেষ করে সহীহ হাদীসে গায়েবের পাঁচটি বস্তু বর্ণনায় যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাও এ তাফসীর সমর্থন করছে। হাদীসে এসেছে, "পাঁচটি বিষয় হলো সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা জানে না ... আল্লাহ ব্যতীত কেউ গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস হয় তা জানে না।" [বুখারীঃ ৪৬৯৭] আর এটা সর্বজনবিদিত যে, গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয় বা হবে তা কেউ কোন দিন বলে দিতে পারবে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত—যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। [সূরা আন-নাজম: ৩২] আরও বলেন, "তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন।" [সূরা আলে ইমরান: ৬] আয়াতের আরেক অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই জানেন কোন মহিলা কোন ধরণের সন্তান গর্ভে ধারণ করবে। তখন ماটি হবে موصولة

عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلۡكَبِيرُ ٱلۡمُتَعَالِ

৯. তিনি গায়েব ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী, মহান, সর্বোচ্চ।

আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ যে, তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনিভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

الْكَبِيرُশব্দের অর্থ বড় এবং الْمُتَعَالِ-এর অর্থ উচ্চ তিনি মান মর্যাদার দিক থেকে যেমন সবার উপরে, ক্ষমতার দিক থেকেও সবার উপরে। অনুরূপভাবে তিনি অবস্থানের দিক থেকেও সবার উপরে। [ইবনুল কাইয়েম, মাদারিজুস সালেকীন: ১/৫৫] উভয় শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তিনি সবার চেয়ে বড়, তিনি সবকিছুর উপরে। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর উর্ধ্বে। কাফের ও মুশরিকরা আল্লাহ তা'আলার মহত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি-দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তার জন্য এমনসব গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তার মর্যাদার পক্ষে খুবই অসম্ভব। তিনি সেগুলো থেকে অনেক উর্ধ্বে। [ফাতহুল কাদীর]

উদাহরণতঃ ইয়াহুদী ও নাসারাগণ আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আরবের মুশরিকগণ আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। কুরআনুল কারীম তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছেঃ (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ) [সূরা আল-মু'মিনূনঃ ৯১] - অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঐসব গুণ থেকে পবিত্র যেগুলো তারা বর্ণনা করে। প্রথম (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ)এবং তৎপূর্ববর্তী (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ) বাক্যে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় الْكَبِيرُ) (الْمُتَعَالِবাক্যে শক্তি ও মাহাত্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তার শক্তি ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে।

سَوَآءٞ مِّنكُم مَّنۡ أَسَرَّ ٱلۡقَوۡلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنۡ هُوَ مُسۡتَخۡفِۭ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُۢ بِٱلنَّهَارِ

১০. তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে বা যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সবাই আল্লাহর নিকট সমান।

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন। পবিত্র কুরআনের অন্যান্য স্থানেও এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ "তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।" [সূরা আল-মুলকঃ ১৩-১৪] আরো বলেছেনঃ "যদি আপনি উচ্চকণ্ঠে কথা বলেন, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সবই জানেন।" [সূরা ত্বা-হাঃ ৭] অন্য আয়াতে বলেছেনঃ "এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর আর যা প্রকাশ কর।" [সূরা আন-নামলঃ ২৫]

অন্যত্র বলেছেনঃ "সাবধান! নিশ্চয়ই ওরা তার কাছে গোপন রাখার জন্য ওদের বক্ষ দ্বিভাঁজ করে। সাবধান! ওরা যখন নিজেদেরকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে তখন ওরা যা গোপন করে ও প্রকাশ করে, তিনি তা জানেন। অন্তরে যা আছে, নিশ্চয়ই তিনি তা সবিশেষ অবহিত [সূরা হুদঃ ৫] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্তে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়ই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়ই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তার শক্তি সমভাবে পরিব্যপ্ত। কেউ তার ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত নয়।

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

১১. আর মানুষের জন্য রয়েছে তাঁর সামনে ও পিছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। নিশ্চয় আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আর কোন সম্প্রদায়ের জন্য যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছে করেন তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই।

مُعَقِّبَاتٌশব্দটি معقبةএর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি হয়ে আসে, তাকে معقبةঅথবা متعقبةবলা হয়। (مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ) এর শাব্দিক অর্থ, উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। (مِنْ خَلْفِهِ) এর অর্থ পশ্চাদিক। আয়াতের কয়েকটি অর্থ করা হয়ে থাকে।

এক. তারা আল্লাহর নির্দেশের কারণে তাকে হেফাযত করে। [ফাতহুল কাদীর] অর্থাৎ যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ঢেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘুরাফেরা করে- এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। রাতে তাদের থেকে হেফাযত করে।

যেমন আরও কিছু ফেরেশতা রয়েছে যারা তার ভাল কিংবা মন্দ আমল হেফাযত করে। রাতে কিছু ফেরেশতা দিনে কিছু ফেরেশতা। তার ডানে বামে দুজন, যারা তার আমল লিখে। ডান দিকের ফেরেশতা তার সৎকর্ম লিখে, আর বাম দিকের ফেরেশতা তার অসৎকর্ম লিখে। আবার দুজন ফেরেশতা রয়েছে যারা তাকে হেফাযত করে, একজন তার সামনের দিকে অপরজন তার পিছনের দিকে। সুতরাং সে দিনে রাতে চার ফেরেশতার মাঝখানে বসবাস করে। যারা পরিবর্তিতভাবে আগমন করে থাকে। দু'জন আমল হেফাযতকারী আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব। আর বাকী দু’জন লিখক। তাদের আমলনামা লিখে। [ইবন কাসীর]

হাদীসে এসেছেঃ ফিরিশতাদের দুটি দল হেফাযতের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজর ও আসরের সালাতের সময় একত্রিত হন। ফজরের সালাতের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় নেন এবং দিনের পাহারাদাররা কাজ বুঝে নেন। আসরের সালাতের পর তারা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফিরিশতারা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। [বুখারীঃ ৭৪২৯, মুসলিমঃ ৬৩২]

দুই. ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে আয়াতের আরেকটি অর্থ বর্ণিত আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর নির্দেশ থেকে তাকে হেফাযত করে [ইবন কাসীর] অর্থাৎ তার কোন প্রকার আযাব যেমন, জিন ইত্যাদি থেকে তাদেরকে হেফাযত করে। [কুরতুবী] তারপর যখন তার তাকদীর অনুসারে কোন কিছু ঘটার জন্য আল্লাহর নির্দেশ আসে তখন ফিরিশতাগণ সরে পড়ে। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ ‘প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছুসংখ্যক হেফাযতকারী ফিরিশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয়, কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয়, ইত্যাদি বিষয়ে ফিরিশতাগণ তার হেফাযত করেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ তবে কোন মানুষের তাকদীর লিখিত বিপদাপদে জড়িত হওয়ার সময় ফিরিশতারা সেখান থেকে সরে যায়। [ইবনে হাজারঃ ফাতহুল বারী ৮/৩৭২] অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই একজন ফিরিশতা এবং একজন শয়তান জুড়ে দেয়া আছে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার সাথেও? তিনি উত্তরে বললেনঃ হ্যাঁ, তবে আল্লাহ আমাকে তার উপর সহযোগিতা করেছেন, ফলে সে আত্মসমর্পন করেছে, বা আমি নিরাপদ হয়ে গেছি, সে আমাকে ভাল কাজ ছাড়া আর কোন

কিছুর নির্দেশ দেয় না। [মুসলিমঃ ২৮১৪]। মোটকথা এই যে, হেফাযতকারী ফিরিশতা দ্বীন ও দুনিয়া উভয় দিকের বিপদাপদ থেকেই মানুষকে নিদ্রায় ও জাগরণে হেফাযত করে। [ইবন কাসীর]

"আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তন করে না নেয়।" [বাগভী] তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। এ পরিবর্তন হয় তারা নিজেরা করে, অথবা তাদের উপর যারা কর্তৃত্বশীল তারা করে, নতুবা তাদেরই মধ্যকার অন্যদের কারণে সেটা সংঘটিত হয়। যেমন উহুদের মাঠে তীরন্দাযদের স্থান পরিবর্তনের কারণে মুসলিমদের উপর বিপদ এসে পড়েছিল। ইসলামী শরীআতে এরকম আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। তবে আয়াতের অর্থ এ নয় যে, তিনি কারও কোন গুনাহ ব্যতীত তাদের উপর বিপর্যয় দেন না। বরং কখন কখনও অপরের গুনাহের কারণে বিপর্যয় নেমে আসে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, আমাদের মধ্যে নেককাররা থাকা অবস্থায় কি আমাদের ধ্বংস করা হবে? তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, যখন অন্যায় অপরাধ ও পঙ্কিলতা বৃদ্ধি পায়। [বুখারী ৩৩৪৬; মুসলিম: ২৮৮০]

সারকথা এই যে, মানুষের হেফাযতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তার আনুগত্য ত্যাগ করে পাপাচার, ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহর গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এটা এজন্যে যে, যদি কোন সম্প্রদায় নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করে তবে আল্লাহ এমন নন যে, তিনি ওদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তাতে পরিবর্তন আনবেন: [সূরা আল আনফালঃ ৫৩]

বলাবাহুল্য, যখন আল্লাহ তা'আলাই কাউকে আঘাত দিতে চান, বিপদে ফেলতে চান, অসুখ দিতে চান, রোগাক্রান্ত করতে চান, তখন কেউ তার সে বিপদ ফেরাতে পারে না [কুরতুবী] আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থেও কেউ এগিয়ে আসতে পারে না। সুতরাং তোমরা এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করো না যে, যাই কিছু করতে থাকো না কেন আল্লাহর দরবারে এমন কোন শক্তিশালী পীর, ফকীর বা কোন পূর্ববতী-পরবর্তী মহাপুরুষ অথবা কোন জিন বা ফেরেশতা আছে যে তোমাদের নযরানার উৎকোচ নিয়ে তোমাদেরকে অসৎকাজের পরিণাম থেকে বাঁচাবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, "এবং অপরাধী সম্প্রদায়ের উপর থেকে তার শাস্তি রদ করা হয় না।" [আল-আনআমঃ ১৪৭] আরো বলেছেন অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমাদের শাস্তি রদ করা যায় না [সূরা ইউসুফঃ ১১০]

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّ طَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

১২. তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও আশা-আকাংখারুপে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ;

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করান। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশার সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন। [বাগভী] আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এখানে মুসাফিরের জন্য কষ্টের ভয় এবং মুকীম বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীর জন্য আশার বৃষ্টি ও রহমতের কারণ বলা হয়েছে।

وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَ هُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَ هُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ

১৩. আর রা'দ তার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং ফেরেশতাগণও তা-ই করে তার ভয়ে। আর তিনি গর্জনকারী বজ্র পাঠান অতঃপর যাকে ইচ্ছে তা দ্বারা আঘাত করেন এবং তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে, আর তিনি শক্তিতে প্রবল শাস্তিতে কঠোর।

অর্থাৎ রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা তার ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। মুজাহিদ বলেন, রা'দ বলে যদি মেঘের গর্জন বুঝা হয়, তবে এ তাসবীহ পাঠ করার অর্থ হবে আল্লাহ তাতে জীবন সৃষ্টি করেন। [কুরতুবী] অথবা এটা ঐ তাসবীহ যা কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, "সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তারই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না।" [সূরা আল-ইসরাঃ ৪৪] [ইবন কাসীর] কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ফিরিশতার নাম রা'দ। [দেখুন, তিরমিযীঃ ৩১১৭] এই অর্থে তাসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

হাদীসে এসেছে, এক প্রতাপশালী লোকের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে পাঠালে সে লোক বললঃ কে আল্লাহর রাসূল? আল্লাহ কি? সোনার না রূপার? নাকি পিতলের? এভাবে তিনবার সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঠানো লোককে বলে পাঠাল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার উপর আকাশ থেকে বজ্রপাত করালেন। ফলে তার মাথা গুড়িয়ে যায়। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। [ইবনে আবি আসেমঃ আস সুন্নাহঃ ৬৯২]

এখানে محالশব্দটি মীমের নীচে كسرةবা যের যোগে। যার অর্থঃ কৌশল, শক্তিসামর্থ্য ইত্যাদি [বাগভী] শব্দটির বিভিন্ন অর্থ অনুসারে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। [মুয়াসসার] তার সামনে সবার চাতুরী অচল। যে কোন সময় যে কারো বিরুদ্ধে যে কোন কৌশল তিনি এমন পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে পারেন যে, আঘাত আসার এক মুহূর্ত আগেও সে জানতে পারে না কখন কোন দিক থেকে তার উপর আঘাত আসছে। এ ধরনের একচ্ছত্র শক্তিশালী সত্তা সম্পর্কে যারা না ভেবেচিন্তে এমনি হালকাভাবে আজেবাজে কথা বলে, কে তাদের বুদ্ধিমান বলতে পারে? তাঁর ক্ষমতা ও কৌশল সম্পর্কে কারও কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তিনি যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও থেকে কেউই পালিয়ে যেতে পারবে না। [সা'দী] সুতরাং যদি তিনিই কেবল বান্দাদের জন্য বৃষ্টি নিয়ে আসেন, তাদের জন্য রিযিকের মৌলিক ব্যবস্থাপনা করেন, তিনিই যদি তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, সমস্ত বড় বড় সৃষ্টি যেগুলো বান্দাদের মনে ভীতির উদ্রেক করে এবং বিরক্তির সঞ্চার করে তারাও যদি তাঁকেই ভয় পায়, তবে তো তিনিই সবচেয়ে বেশী শক্তিমান। একমাত্র তিনি ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। আর তাই পরবর্তী আয়াতে তাকে ডাকার কথা বলা হয়েছে। [সা'দী]

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَیْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ

১৪. সত্যের আহবান তারই। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহবান করে, তাদেরকে কোন কিছুতেই তারা সাড়া দেয় না? তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌছবে এ আশায় তার দুহাত মেলে ধরে পানির দিকে, অথচ তা তার মুখে পৌছার নয়, আর কাফিরদের আহ্বান তো কেবল ভ্রষ্টতায় নিপতিত।

ডাকা মানে নিজের অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য ডাকা। এর মানে হচ্ছে, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণ এবং সংকটমুক্ত করার সব ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত। তাই একমাত্র তাঁর কাছেই প্রার্থনা করা সঠিক ও যথার্থ সত্য বলে

বিবেচিত। তাঁর আহবানই হক্ক আহবান। সে আহবানের মূল হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। তিনি আল্লাহ ব্যতীত হক্ক কোন মা’বুদ নেই। (دَعْوَةُ الْحَقِّ)শব্দের তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এটাই বর্ণিত আছে। [দেখুন, তাবারী]

মুজাহিদ রাহেমাহুল্লাহ এর তাফসীরে বলেন, সে লোক মুখে পানির জন্য আহবান করছে আর পানির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। এভাবে তো আর পানি কখনো মুখে পৌছে না। পানি পৌছার জন্য পানিকে আহবান না করে তা নিয়ে মুখে দিয়ে দিতে হয়। [আত-তাফসীরুস সহীহ] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এটা হলো মুশরিকের উদাহরণ। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে তার উদাহরণ ঐ পিপাসার্ত ব্যক্তির মত যে তার মনে মনে পানির কথা ভেবে দূর থেকে পানি পাওয়ার আশা করে বসে আছে। সে পানি পাওয়ার শত আশা করলেও পানি পেতে পারে না। [তাবারী] তদ্রুপ মুশরিক ব্যক্তিও আল্লাহ ছাড়া অপর যাদেরকে ডাকে তাদের কাছে তার মনের যাবতীয় আশা-আকাংখা পূরণের আশা করে বসে আছে। কিন্তু তার আশা তো এভাবে কখনো পূরণ হবার নয়। তাকে তা পূরণ করতে হলে একমাত্র আল্লাহর কাছেই যেতে হবে।

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ

১৫. আর আল্লাহর প্রতিই সিজদাবনত হয় আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়। [সাজদাহ] ۩

সিজদা মানে আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য ঝুঁকে পড়া, আদেশ পালন করা এবং পুরোপুরি মেনে নিয়ে মাথা নত করা। পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর আইনের অনুগত এবং তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণও বিরোধিতা করতে পারে না -এ অর্থে তারা প্রত্যেকেই আল্লাহকে সিজদা করছে। মুমিন স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে তাঁর সামনে নত হয় কিন্তু কাফেরকে বাধ্য হয়ে নত হতে হয়। কারণ আল্লাহর প্রাকৃতিক আইনের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা নেই। আর তারা নিজেরা স্রষ্টার মুখাপেক্ষী এটা প্রমাণ করছে। [কুরতুবী]

তাদের ছায়াগুলো নত হওয়া ও সিজদা করার মানে হচ্ছে, ছায়ার সকাল-সাঁঝে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে সিজদা করা। এ এমন একটি আলামত যা থেকে বুঝা যায় যে, এসব জিনিস কারো হুকুমের অনুগত এবং কারোর নিয়ন্ত্রণাধীন। [কুরতুবী] মুফাসসিরগণ বলেন, সিজদাকারীদের কেউ ইচ্ছাকৃত আল্লাহর সিজদা করে আবার কেউ করে অনিচ্ছাকৃত কিন্তু তাদের ছায়াগুলো ঠিকই ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে। [বাগভী] মুজাহিদ বলেন, ঈমানদারের ছায়া ইচ্ছাকৃত সিজদা করে, আর সেও তা মেনে নিয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেরের ছায়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে অথচ সে অপছন্দ করছে। [তাবারী] এ আয়াতের সমার্থে আরো এসেছে, “তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়? [সূরা আন-নাহলঃ ৪৮]

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

১৬. বলুন, কে আসমানসমূহ ও যমীনের রব? বলুন, আল্লাহ। বলুন, তবে কি তোমরা অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বলুন, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে? তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? বলুন, ‘আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী

উল্লেখ করা যেতে পারে, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের রব একথা তারা নিজেরা মানতো। এ প্রশ্নের জবাবে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারতো না। কারণ একথা অস্বীকার করলে তাদের নিজেদের আকীদাকেই অস্বীকার করা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিজ্ঞাসার পর তারা এর জবাব পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছিল। কারণ স্বীকৃতির পর ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাওহীদকে মেনে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠতো এবং এরপর শির্কের জন্য আর কোন যুক্তিসংগত

বুনিয়াদ থাকতো না। তাই নিজেদের অবস্থানের দুর্বলতা অনুভব করেই তারা এ প্রশ্নের জবাবে কিছু বলত না। এ কারণেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা কে? বিশ্ব-জাহানের রব কে? কে তোমাদের রিযিক দিচ্ছেন? তারপর হুকুম দেন, আপনি নিজে নিজেই বলুন আল্লাহ এবং এরপর এভাবে যুক্তি পেশ করেন যে, আল্লাহই যখন এ সমস্ত কাজ করছেন তখন আর কে আছে যার তোমরা বন্দেগী করে আসছো?

এখানেও আল্লাহ তাদের সেই স্বীকারোক্তির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই এ কথার স্বীকৃতি আদায় করছেন। কেননা, তারা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের রব হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন, এতদসত্বেও তারা আল্লাহ ছাড়া বহু অভিভাবক ইলাহ গ্রহণ করে সেগুলোর ইবাদাত করছে, অথচ ইলাহগুলো না নিজেদের কোন লাভ-ক্ষতির মালিক, না তাদের ইবাদতকারীদের। সেগুলো তাদের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর তাদের কোন ক্ষতিও দূর করতে পারে না। তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে, যে আল্লাহর সাথে এ সমস্ত ইলাহের ইবাদাত করে, আর যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না, আর সে তার রব প্রদত্ত স্পষ্ট আলোতে রয়েছে? [ইবন কাসীর]

এখানে তিনি ঈমানদার ও কাফেরের জন্য একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যেভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না তেমনি কাফের ও ঈমানদার সমান হতে পারে না। [বাগভী] মুমিন হক প্রত্যক্ষ করে, পক্ষান্তরে মুশরিক হক দেখে না। [কুরতুবী] অথবা এখানে অন্ধ বলে তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইবাদাত করতো তাদেরকে বুঝানো হয়েছে আর চক্ষুষ্মান বলে স্বয়ং আল্লাহকেই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী]

চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? নাকি অন্ধকার ও আলো- আলো মানে সত্যজ্ঞানের আলো। এখানে উদ্দেশ্য ঈমান। [কুরতুবী] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা এ সত্য জ্ঞানের আলো ঈমান লাভ করেছিলেন। আর আঁধার মানে কুফরী। [কুরতুবী] কুফরীতে রয়েছে মূর্খতার আঁধার। নবীর অস্বীকারকারীরা এ আঁধারে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং আলো ও আঁধার কখনও সমান হতে পারে না। যে ব্যক্তি আলো পেয়ে গেছে সে কেন নিজের প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আঁধারের বুকে হোচট খেয়ে ফিরতে থাকবে?

সমান হতে পারে? তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক করেছে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের কাছে সদৃশ মনে হয়েছে? - এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, যদি দুনিয়ার কিছু জিনিস আল্লাহ সৃষ্টি করে থাকতেন এবং কিছু জিনিস অন্য মাখলুকরা সৃষ্টি করতো আর কোনটা আল্লাহর সৃষ্টি এবং কোনটা অন্যদের এ পার্থক্য করা সম্ভব না হতো তাহলে তো সত্যিই শিরকের জন্য কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি হতে পারতো। কিন্তু ব্যাপারটি এ রকম নয়। [দেখুন, ইবন কাসীর] কারণ, তাঁর হুবহু যেমন কিছু নেই তেমনি তার মতও কিছু নেই। তার কোন সমকক্ষ নেই, তাঁর অনুরূপ কেউ নেই, তার কোন মন্ত্রী-সাহায্যকারী নেই, তাঁর কোন সন্তান নেই, আর না আছে তাঁর কোন সঙ্গিনী। আল্লাহর মর্যাদা এ সমস্ত বিষয়াদি থেকে বহু উর্ধ্বে। এ মুশরিকরা নিজেরাই স্বীকৃতি দিচ্ছে যে, এ সমস্ত মাবুদ যাদের ইবাদাত তারা করছে সেগুলো আল্লাহরই বান্দা, তাঁরই সৃষ্ট, যেমন তারা তাদের শির্কী তালবিয়াতে বলতঃ হাজির, তাঁর কোন শরীক নেই, তবে সে শরীক, যার কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে, আল্লাহর কর্তৃত্ব সে শরীকের কাছে নেই। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, আমরা তো এদের ইবাদত এ জন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে। [সূরা আয-যুমার: ৩]

তারা যেহেতু এ ধরণের বিশ্বাস করে থাকে তাই আল্লাহ্ সেটা অস্বীকার করে বলেছেন যে, তার অনুমতি ব্যতীত কেউ নেই যে, সুপারিশ করবে। আর যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। [সূরা সাবাঃ ২৩] আরও বলেন, “আসমানসমূহ ও যমীনে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গুণে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে আসবে একাকী অবস্থায়। [সূরা মারইয়াম: ৯৩-৯৫] সুতরাং এসবই যখন বান্দা ও দাস, তখন বিনা দলীল-

প্রমাণে শুধু মতের উপর নির্ভরশীল হয়ে একে অপরের ইবাদত কেন করবে? তারপর আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলদের সবাইকে প্রথমজন থেকে শেষজন পর্যন্ত সবাইকে এথেকে সাবধান করে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করতে নিষেধ করার জন্যই পাঠিয়েছেন। ফলে তারা তার রাসূলদের উপর মিথ্যারোপ করল এবং তাদের বিরোধিতায় লিপ্ত হলো, তাই তাদের উপর শাস্তির বাণী যথাযথ ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেল। “আর আপনার রব কারও উপর যুলুম করেন না” [সূরা আল-কাহাফঃ ৪৯] [ইবন কাসীর]

বলুন, ‘আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা- কেননা, কোন বস্তু নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেছে সেটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার সৃষ্ট কোন কিছু স্রষ্টা ছাড়া এসেছে সেটাও অসম্ভব। তাতে বুঝা গেল যে, একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন। সৃষ্টিতে যার কোন শরীক থাকতে পারে না। কেননা, তিনি এক ও দাপুটে। আল্লাহ ব্যতীত আর কারও জন্য একক ও মহাদাপুটে গুণ সাব্যস্ত করা যায় না। সৃষ্টিকুল এবং প্রতিটি সৃষ্টির উপরই কোন না কোন নিয়ন্ত্রণকারী দাপট দেখানোর মত সৃষ্টি রয়েছে। তারপর তারও উপর রয়েছে আরেক নিয়ন্ত্রণকারী। কিন্তু তার উপর রয়েছেন সেই মহা দাপুটে সর্বনিয়ন্ত্রণকারী একক সত্তা। সুতরাং দাপট ও তাওহীদ একটি অপরটিকে বাধ্য করে। যা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। এভাবে বিবেকের শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে আহবান করে তাদের কেউই সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। আর এভাবেই তাদের ইবাদাত বাতিল প্রমাণিত হলো। [সা'দী]

আর তিনি এক, মহা প্রতাপশালী- মূল আয়াতে ‘কাহ্‌হার’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার উপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্ত করে রাখেন। যার ইচ্ছার কাছে সমস্ত ইচ্ছাকারী হার মানে। [কুরতুবী] “আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা” একথাটি এমন সত্য যাকে মুশরিকরাও স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারা কখনো এটা অস্বীকার করেনি। “তিনি এক ও মহাপরাক্রমশালী বা মহা দাপুটে” এটি হচ্ছে মুশরিকদের ঐ স্বীকৃত সত্যের অনিবার্য ফল। কারণ যিনি প্রত্যেকটি জিনিসের স্রষ্টা নিঃসন্দেহে তিনি এক, অতুলনীয় ও সাদৃশ্যবিহীন। কারণ অন্য যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি।

এ অবস্থায় কোন সৃষ্টি কেমন করে তার স্রষ্টার সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা বা অধিকার তথা ইবাদতে তাঁর সাথে শরীক হতে পারে? এভাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহাপরাক্রমশালীও। কারণ সৃষ্টি তার স্রষ্টার অধীন হয়ে থাকবে, এটিই স্বাভাবিক। কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্রষ্টা বলে মানে তার পক্ষে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির বন্দেগী করা এবং মহাপরাক্রমশালী সর্বনিয়ন্ত্রক আল্লাহকে বাদ দিয়ে দুর্বল ও অধীনকে সংকট উত্তরণ করাবার জন্য আহবান করা একেবারেই অযৌক্তিক প্রমাণিত হলো। [দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, আস-সাওয়ায়িকুল মুরসালাহ ২/৪৬৪-৪৬৫; মাদারিজুস সালেকীন ১/৪১৪]

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ؕ وَمِمَّا يُوْقِدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ
كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۚ وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ

১৭. তিনি আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন, ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে। এরূপে আবর্জনা উপরিভাগে আসে যখন আলংকার বা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু আগুন উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ্‌ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।

অর্থাৎ নির্ভেজাল ধাতু গলিয়ে কাজে লাগাবার জন্য স্বর্ণকারের চুলা গরম করা হয়। কিন্তু যখনই এ কাজ করা হয় তখনই অবশ্যি ময়লা আর্বজনা ওপরে ভেসে ওঠে এবং এমনভাবে তা ঘূর্ণিত হতে থাকে যাতে কিছুক্ষণ পর্যন্ত উপরিভাগে শুধু আর্বজনরাশিই দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মূলত দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। একটি পানির, অপরটি আগুনের। এ দুটি উদাহরণে আল্লাহ্ তা'আলা হক্ যে স্থায়ী এবং বাতিল যে ক্ষণস্থায়ী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণ দুটির মধ্যে প্রথমটি হল, আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করেন তখন উপত্যকাসমূহ তাদের নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। যদি উপত্যকাটি বড় হয়, তবে বেশী পানি ধারণ করে। আর যদি ছোট হয় তবে তার নিজের পরিমাণ অনুযায়ী পানি ধারণ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহীর মাধ্যমে যে জ্ঞান নাযিল করা হয়েছিল এ উপমায় তাকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর ঈমানদার, সুস্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৃত্তির অধিকারী মানুষদেরকে এমনসব নদীনালার সাথে তুলনা করা হয়েছে যেগুলো নিজ নিজ ধারণক্ষমতা অনুযায়ী রহমতের বৃষ্টি ধারায় নিজেদেরকে পরিপূর্ণ করে প্রবাহিত হতে থাকে। তাদের মধ্যে জ্ঞানের তারতম্য আছে।

একজনের মনে অনেক জ্ঞান ধারণ করে। আরেক জনের মন বেশী জ্ঞান ধারণ করতে পারে না। অন্যদিকে সত্য অস্বীকারকারী ও সত্য বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে হৈ-হাংগামা ও উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল তাকে এমন ফেনা ও আবর্জনারাশির সাথে তুলনা করা হয়েছে যা হামেশা বন্যা হবার সাথে সাথেই পানির উপরিভাগে উঠে আসতে থাকে। প্লাবন তার উপরে আবর্জনা বহন করে বলে এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এগুলো মূলতঃ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির সমষ্টি। হকের সাথে এগুলোও মানুষের ওহীর পরিমাণ অনুসারে দ্রুত অথবা ধীরে ধীরে তারা তাদের ঈমানী জোরে সে সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তিকে দূরীভূত করে দিতে পারে। তখন শুধুমাত্র ঈমান বাকী থাকে। আর যা কুফর ও সন্দেহ সেগুলো অপসৃত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হল, আগুণে পুড়ে খাটি হওয়ার উদাহরণ। সোনা, রূপা এবং এ জাতীয় ধাতব বস্তু যখনই পোড়ানো হয় তখন তার মধ্যস্থিত যাবতীয় ময়লা ও খাদ আলাদা হয়ে যায়। শুধু খাঁটি অংশই বাকী থাকে। তেমনিভাবে ঈমান যখন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে তখন যৎসামান্য তাতে ময়লা-আবর্জনা সহ অবস্থান করতে থাকে। তারপর ঈমান ও দলীল-প্রমাণাদি পরপর তার কাছে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তার সমস্ত সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে সে খাঁটি হয়ে যায়। তার মনে আর কোন পংকিলতা স্থান পায় না।

এ দুটি উদাহরণের আরেকটি দিক হলো, আল্লাহর দরবারে যতক্ষণ কোন আমল খাঁটিভাবে তাঁর উদ্দেশ্যে না হবে ততক্ষণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তির তাড়না থাকবে ততক্ষণ তা দূর করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। [ইবন কাসীর; অনুরূপ আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেম, ইলামুল মুওয়াকেয়ীন ১/১১৭; ইগাসাতুল লাহফান: ১/২১; আল-আমসাল ফিল কুরআন ১১]

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ؕ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهٗ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

১৮. যারা তাদের রবের ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য রয়েছে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। আর যারা তার ডাকে সাড়া দেয় না, যমীনে যা কিছু আছে তার সবটুকুই যদি তারা মালিক হতো এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরো কিছুও হতো তাহলেও তারা মুক্তিপণস্বরূপ তা দিত তাদেরই হিসেব হবে কঠোর। এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস, আর সেটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সৌভাগ্যশালী এবং দূর্ভাগাদের অবস্থা পরবর্তীতে কেমন তা ব্যাখ্যা করেছেন। একদিকে ঐ সমস্ত লোকগণ যারা তাদের প্রভুর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। রাসূলের কথা মেনেছে, তার যাবতীয় কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তাদের পরিণাম হবে ভাল। জান্নাত ও জান্নাতের যাবতীয় নে'আমত তারা পাবে। অপরদিকে ঐসমস্ত লোক যারা তাদের প্রভুর কথা মানেনি। নবী-রাসূলদের কথা শুনেনি। তাদের উপর এমন বিপদ আসবে যার ফলে তারা নিজেদের

জান বাঁচাবার জন্য দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেবার ব্যাপারে একটুও ইতস্তত করবে না। কিন্তু তারা কোত্থেকেই তা দিবে? [দেখুন, সা'দী]

কঠোর বা নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। কুরআন থেকে আমরা আরো জানতে পারি, এ ধরনের হিসেব আল্লাহ তাঁর এমন বান্দাদের থেকে নেবেন যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছে। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে। তাদের বিশ্বস্ততামূলক কার্যক্রমের মোকাবিলায় ত্রুটি-বিচুতিগুলো মাফ করে দেয়া হবে। তাদের সামগ্রিক সুকৃতিকে সামনে রেখে তাদের বহু ভুল-ভ্রান্তি উপেক্ষা করা হবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেনঃ যখন "যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে সে তার শাস্তি পাবে" এ আয়াত নাযিল হলো, তখন সাহাবায়ে কিরামের কাছে তা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সহজ কর, কাছাকাছি হও, আল্লাহর বিশ্বস্ত ও অনুগত বান্দা দুনিয়ায় যে কষ্টই পেয়েছে, এমনকি তার শরীরে যদি কোন কাঁটাও ফুটে থাকে তাকে তার কোন অপরাধের শাস্তি হিসেবে গণ্য করে দুনিয়াতেই তার হিসেব পরিষ্কার করে দেন। [মুসলিমঃ ২৫৭৪]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আল্লাহর এ উক্তির তাৎপর্য কি যাতে বলা হয়েছেঃ "যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হালকা হিসেব নেয়া হবে" এর জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, উপস্থাপনা (অর্থাৎ তার সৎকাজের সাথে সাথে অসৎকাজগুলোর উপস্থাপনা আল্লাহর সামনে) অবশ্যি হবে কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তার ব্যাপারে জেনে রাখো, সে ধ্বংস হবে।" [বুখারীঃ ১০৩, মুসলিমঃ ২৮৭৬]

ফুটনোট

➢ আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ হল, তিনি আলেমুল গায়েব। পাঁচটি বিষয় হলো সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি, আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা জানে না। সূরা লোকমানে উল্লেখ রয়েছে- "**নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন নারীদের জড়ায়ূতে বা গর্ভাশয়ে যা থাকে। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে বা যায়গায় বা দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।**" (আল কুরআন ৩১: ৩৪)

➢ মায়ের গর্ভাশয়ে ভ্রূণের অংগ-প্রত্যংগ, শক্তি-সামর্থ, যোগ্যতা ও মানসিক ক্ষমতার যাবতীয় হ্রাস-বৃদ্ধি আল্লাহর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধিত হয়। একমাত্র আল্লাহই জানেন কোন মহিলা কোন ধরণের সন্তান গর্ভে ধারণ করবে।

➢ ইয়াহুদী ও নাসারাগণ আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আরবের মুশরিকগণ আল্লাহর জন্য কন্যা সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। উচ্চ তিনি মান মর্যাদার দিক থেকে যেমন সবার উপরে, ক্ষমতার দিক থেকেও সবার উপরে।

➢ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন।

➢ মানুষ দিনে রাতে চার ফেরেশতার মাঝখানে বসবাস করে। যারা পরিবর্তিতভাবে আগমন করে থাকে। দু'জন আমল হেফাযতকারী আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হেফাযত করা তাদের দায়িত্ব। আর বাকী দু'জন লিখক। তাদের আমলনামা লিখে।

➢ কোন মানুষের তাকদীর লিখিত বিপদাপদে জড়িত হওয়ার সময় ফিরিশতারা সেখান থেকে সরে যায়।

➢ আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তন করে না নেয়।

➢ মানুষের হেফাযতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরিশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তার আনুগত্য ত্যাগ করে পাপাচার, ভ্রষ্টতা ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহর গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে।

➢ বিদ্যুৎ চমকানো আল্লাহর একটি নিদর্শন। এতে রয়েছে ভয় ও আশার শিক্ষা। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও হলো, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশার সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন।

➢ রা'দ আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা তার ভয়ে তাসবীহ পাঠ করে। রা'দ বলে যদি মেঘের গর্জন বুঝা হয।

(دَعْوَةُ الْحَقِّ)তাঁর আহবানই হক্ব আহবান। সে আহবানের মূল হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'- আল্লাহ ব্যতীত হক্ব কোন মা'বুদ নেই।

➢ ঈমানদারের ছায়া ইচ্ছাকৃত সিজদা করে, আর সেও তা মেনে নিয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেরের ছায়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদা করে অথচ সে অপছন্দ করছে।

➢ কাফেরেরা স্বীকার করে যে, আসমান ও যমীনের রব হচ্ছেন আল্লাহ, তিনিই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন। কিন্তু তারা এক আল্লাহ্কে ইলাহ হিসাবে না মেনে আরো বহু অভিভাবক ইলাহ গ্রহণ করে সেগুলোর ইবাদাত করছে।

➢ যেভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না তেমনি কাফের ও ঈমানদার সমান হতে পারে না।

কোন বস্তু নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেছে সেটা অসম্ভব ব্যাপার। আবার সৃষ্ট কোন কিছু স্রষ্টা ছাড়া এসেছে সেটাও অসম্ভব। সবকিছুর একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছেন।

➢ 'কাহ্হার' শব্দ ব্যবহৃত করার মানে হচ্ছে, এমন সত্তা যিনি নিজ শক্তিতে সবার উপর হুকুম চালান এবং সবাইকে অধীনস্ত করে রাখেন। যার ইচ্ছার কাছে সমস্ত ইচ্ছাকারী হার মানে।

➢ ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মূলত দুটি উদাহরণ পেশ করেছেন। একটি পানির, অপরটি আগুনের। এ দুটি উদাহরণে আল্লাহ্ তা'আলা হক্ যে স্থায়ী এবং বাতিল যে ক্ষণস্থায়ী তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

➢ কঠোর বা নিকৃষ্টভাবে হিসেব নেয়া অথবা কড়া হিসেব নেয়ার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের কোন ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হবে না। তার কোন অপরাধের বিচার না করে তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে না। বিপরীতপক্ষে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বস্ত আচরণ করেছে এবং তাঁর প্রতি অনুগত থেকে জীবন যাপন করেছে তাদের থেকে "সহজ হিসেব" অর্থাৎ হালকা হিসেব নেয়া হবে।